سورة ق

সূরা ক্বাফ

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪৫, আয়াত ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ﴿١﴾ بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ

فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٢﴾ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ

ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ﴿٣﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ

وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ﴿٤﴾ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ

فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ﴿٥﴾ اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا

وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ﴿٦﴾ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا

رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ﴿٧﴾ تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى

لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ﴿٨﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا

بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ﴿١٠﴾

رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۗ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ﴿١٢﴾ وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ

لُوْطٍ ﴿١٣﴾ وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۗ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ﴿١٤﴾

اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ۗ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٥﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(১) সম্মানিত কোরআনের শপথ; (২) বরং তারা তাদের মধ্য থেকেই একজন ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেছে দেখে বিস্ময় বোধ করে। অতঃপর কাফিররা বলে ঃ এটা আশ্চর্যের ব্যাপার! (৩) আমরা মরে গেলে এবং মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলেও কি পুনরুত্থিত হব? এ প্রত্যাবর্তন সুদূরপরাহত। (৪) মৃত্তিকা তাদের কতটুকু গ্রাস করবে, তা আমার জানা আছে এবং আমার কাছে আছে সংরক্ষিত কিতাব। (৫) বরং তাদের কাছে সত্য আগমন করার পর তারা তাকে মিথ্যা বলছে। ফলে তারা সংশয়ে পতিত রয়েছে। (৬) তারা কি তাদের উপরস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না---আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোন ছিদ্রও নেই। (৭) আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার বোঝা স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদ্গত করেছি, (৮) প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্য জ্ঞান ও স্মরণিকাস্বরূপ। (৯) আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্দ্বারা আমি বাগান ও শস্য উদগত করি, যেগুলোর ফসল আহরণ করা হয় (১০) এবং লম্বমান খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর, (১১) বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত দেশকে সঞ্জীবিত করি। এমনিভাবে পুনরুত্থান ঘটবে। (১২) তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে নূহের সম্প্রদায়, কূপবাসীরা এবং সামূদ সম্প্রদায়, (১৩) আদ, ফিরাউন ও লূতের সম্প্রদায়, (১৪) বনবাসীরা এবং তুব্বা সম্প্রদায়। প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যা বলেছে, অতঃপর আমার শাস্তির যোগ্য হয়েছে। (১৫) আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? বরং তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ক্বাফ (-এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন)। সম্মানিত কোরআনের শপথ (অর্থাৎ অন্যান্য কিতাবের চাইতে শ্রেষ্ঠ। আমি আপনাকে কিয়ামতের ভীতি প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেছি, কিন্তু তারা মানে না;) বরং তারা এ বিষয়ে বিস্ময় বোধ করে যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে (অর্থাৎ মানুষের মধ্য থেকে) একজন ভয় প্রদর্শনকারী (পয়গম্বর) আগমন করেছেন, (যিনি তাদেরকে কিয়ামতের ভয় প্রদর্শন করেন)। অতঃপর কাফিররা বলে ঃ (প্রথমত) এটা এক বিস্ময়ের ব্যাপার (যে, মানুষ পয়গম্বর হবে, দ্বিতীয়ত সে এক অদ্ভুত বিষয়ের দাবী করবে যে, আমরা পুনরায় জীবিত হব)। আমরা যখন মরে যাব এবং মৃত্তিকায় পরিণত হব, এরপরও কি পুনরুত্থিত হব? এই পুনরুত্থান সুদূরপরাহত। (মোটকথা এই যে, প্রথমত সে আমাদের মতই মানুষ। পয়গম্বরীর দাবী করার অধিকার তার নেই। দ্বিতীয়ত সে একটি অসম্ভব বিষয়ের দাবী করে অর্থাৎ আমরা মৃত্যুর পরও মাটি হয়ে যাওয়ার পর পুনরুত্থিত হব। এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার সম্ভাব্যতা প্রমাণিত করে তাদের উক্তি খণ্ডন করছেন। এর সার-সংক্ষেপ এই যে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করার দু'টি কারণ হতে পারে। এক. যেসব বিষয়ের পুনরুত্থিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর পুনরুত্থানের যোগ্যতাই না থাকা। এটা প্রত্যক্ষভাবে

ভ্রান্ত। কেননা, সেগুলো বর্তমানে তোমাদের সামনে জীবিত উপস্থিত আছে। জীবিত হওয়ার যোগ্যতাই না থাকলে বর্তমানে কিরূপে জীবিত আছে? দুই. আল্লাহ্ তা'আলার পুনরায় জীবিত করার শক্তি না থাকা, এ কারণে যে, মৃতের যেসব অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, সেগুলো কোথায় কোথায় পড়ে আছে, তা জানা নেই। এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমার জ্ঞানের অবস্থা এই যে,) মৃত্তিকা তাদের কতটুকু গ্রাস করে, তা আমার জানা আছে এবং (আজ থেকেই জানি না; বরং আমার জ্ঞান চিরকালের। এমনকি, ঘটনার পূর্বেই সব বস্তুর সব অবস্থা আমি আমার চিরাগত জ্ঞানের সাহায্যে এক কিতাবে অর্থাৎ 'লওহে মাহ্ফুযে' লিপিবদ্ধ করে দিয়েছিলাম এবং এখন পর্যন্ত) আমার কাছে (সেই) কিতাব (অর্থাৎ লওহে মাহ্ফুয) সংরক্ষিত আছে। তাতে এসব বিক্ষিপ্ত অংশের স্থান, রক্ষণ, পরিমাণ ও গুণ সবকিছু আছে। চিরাগত জ্ঞান কেউ বুঝতে না পারলে তার এরূপ বুঝে নেওয়া উচিত যে, যে দফতরে সবকিছু আছে, তা আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত। কিন্তু তারা এরপর অহেতুক বিস্ময় বোধ করে; শুধু বিস্ময়ই নয়) বরং সত্য কথা নবুওয়ত ও পরকালে পুনরুত্থান ও) যখন তাদের কাছে পৌঁছে তখন তাকে মিথ্যা বলে। তারা এক দোদুল্যমান অবস্থায় পতিত আছে (কখনও বিস্ময় বোধ করে, কখনও মিথ্যা বলে। এটা ছিল মধ্যবর্তী বাক্য। এরপর কুদরত বর্ণিত হচ্ছে ঃ) তারা কি (আমার কুদর-তের কথা জানে না এবং তারা কি) উপরস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না? আমি কিভাবে তা (সমুন্নত ও বৃহৎ) নির্মাণ করেছি এবং (তারকা দ্বারা) সুশোভিত করেছি, তাতে (মজবুতির কারণে) ফাটলও নেই (যেমন অধিকাংশ নির্মাণকাজে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর ফাটল দেখা দেয়। আমার এই কুদরত আকাশে)। ভূমিকে আমি বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার বোঝা স্থাপন করেছি, এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি, যা প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জ্ঞান ও বোঝার উপায় (অর্থাৎ এমন বান্দার জন্য, যে সৃষ্ট জগতকে এভাবে দেখে যে, এগুলো কে সৃষ্টি করেছে? এ থেকেও আমার কুদরত প্রকাশমান যে,) আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্দ্বারা আমি বাগান ও শস্যরাজি উদগত করি এবং লম্বমান খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ। আমি বৃষ্টি দ্বারা মৃত দেশকে জীবিত করি। এমনিভাবে (বুঝে নাও যে,) মৃতদের পুনরুত্থান ঘটবে। (কেননা, আল্লাহ্র সত্তাগত কুদরতের সামনে সব-কিছুই সমান; বরং যে সত্তা বৃহৎ বস্তুসমূহ সৃষ্টি করতে সক্ষম, সে যে ক্ষুদ্র বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, তা বলাই বাহুল্য। এ কারণেই এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, এগুলো সৃষ্টি করা একটি মৃতকে পুনরুজ্জীবন দান করার চাইতে অনেক বড় কাজ। আল্লাহ্ বলেন ঃ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ অতএব এসব বড় বড় কাজ করতে যিনি সক্ষম, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম হবেন না কেন? কাজেই জানা গেল মৃতকে জীবিত করা অসম্ভব নয়---সম্ভবপর এবং জীবিতকারী আল্লাহ্র কুদরত অপার। এমতাবস্থায় এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ অথবা প্রত্যাখ্যান করার কি কারণ থাকতে পারে। অতঃপর যারা প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে সতর্ক করার জন্য অতীত সম্প্রদায়ের ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা যেমন কিয়ামত অস্বীকার করে রসূলকে মিথ্যাবাদী

বলে, তেমনি) তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে নূহের সম্প্রদায়, কূপবাসীরা, সামূদ ও আদ সম্প্রদায়, ফিরাউন, লূতের সম্প্রদায়, বনবাসীরা এবং তুব্বা সম্প্রদায়; (অর্থাৎ) প্রত্যেকেই পয়গম্বরগণকে (অর্থাৎ নিজ নিজ পয়গম্বরকে তওহীদ, রিসালত ও কিয়ামতের ব্যাপারে) মিথ্যাবাদী বলেছে, অতঃপর আমার শাস্তির যোগ্য হয়েছে। (তাদের সবার উপর আযাব এসেছে। এমনিভাবে এদের উপরও আযাব আসবে দুনিয়াতে কিংবা পরকালে। সতর্ক করার পর আবার পূর্বের বিষয়বস্তু ভিন্ন ভংগিতে বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) আমি কি প্রথম-বার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি (যে পুনর্বার জীবিত করতে পারব না। অর্থাৎ একটা সাময়িক বাধা এরূপও হতে পারত যে, কর্মী-ক্লান্ত হয়ে পড়ার কারণে কাজ করতে সক্ষম নয়। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের দোষ ত্রুটি থেকেও পবিত্র। তাঁর উপর কোন কিছুর প্রভাব পড়ে না এবং ক্লান্তি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কাজেই কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে প্রমাণাদি পূর্ণ হয়ে গেল। যারা কিয়ামত অস্বীকার করছে, তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই)। বরং তারা নতুন ভাবে সৃষ্টির ব্যাপারে (প্রমাণ ছাড়াই) সন্দেহ পোষণ করছে, (যা প্রমাণাদির আলোকে ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়)।

সূরা ক্বাফের বৈশিষ্ট্য ঃ সূরা ক্বাফে অধিকাংশ বিষয়বস্তু পরকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা হুজুরাতের উপসংহারেও এমনি বিষয়বস্তু উল্লেখ ছিল। এটাই সূরাদ্বয়ের যোগসূত্র।

একটি হাদীস থেকে সূরা ক্বাফের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। হাদীসে উম্মে হিশাম বিনতে হারিসা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহের সন্নিকটেই আমার গৃহ ছিল। প্রায় দু'বছর পর্যন্ত আমাদের ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রুটি পাকানোর চুল্লিও ছিল অভিন্ন। তিনি প্রতি শুক্র-বারে জুম'আর খোতবায় সূরা ক্বাফ তিলাওয়াত করতেন। এতেই সূরাটি আমার মুখস্থ হয়ে যায়।—(মুসলিম-কুরতুবী)

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) আবূ ওয়াকেদ লাইসী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) দুই ঈদের নামাযে কোন্ সূরা পাঠ করতেন? তিনি বললেন ঃ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ এবং قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের নামাযে অধিকাংশ সময় সূরা ক্বাফ তিলাওয়াত করতেন। —(সূরাটি বেশ বড়) কিন্তু এতদসত্ত্বেও নামায হাল্কা মনে হত।—(কুরতুবী) রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর তিলাওয়াতের বিশেষ প্রভাবেই বৃহত্তম এবং দীর্ঘতম নামাযও মুসল্লীদের কাছে হাল্কা মনে হত।

আকাশ দৃষ্টিগোচর হয় কি? اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ — বাক্য থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, আকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু একথাই সুবিদিত যে, উপরে যে নীলাভ

রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তা শূন্যমণ্ডলের রঙ। কিন্তু আকাশের রঙও যে তাই হবে—একথা অস্বীকার করার কোন প্রমাণ নেই। এ ছাড়া আয়াতে نظر শব্দের অর্থ চর্মচক্ষে দেখা না হয়ে অন্তর চক্ষে দেখা অর্থাৎ চিন্তাভাবনা করাও হতে পারে। —(বয়ানুল-কোরআন)

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কিত একটি বহুল উত্থাপিত প্রশ্নের জওয়াব :

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ কাফির ও মুশরিকরা কিয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন অস্বীকার করে। তাদের সর্ববৃহৎ প্রমাণ এই বিস্ময় যে, মৃত্যুর পর মানুষের দেহের অধিকাংশ অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে দিকবিদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। পানি ও বায়ু মানবদেহের প্রতিটি কণাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয়। কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন দান করার জন্য এই বিক্ষিপ্ত কণাসমূহের অবস্থানস্থল জানা এবং প্রত্যেকটি কণাকে আলাদাভাবে একত্র করার সাধ্য কার আছে? কোরআন পাকের ভাষায় এই প্রশ্নের জওয়াব এই যে, মানুষ তার সসীম জ্ঞানের মাপকাঠিতে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম জ্ঞানকে পরিমাপ করার কারণেই এই পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান এতই বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী যে, মৃত্যুর পর মানবদেহের প্রতিটি অংশ তাঁর দৃষ্টিতে উপস্থিত থাকে। তিনি জানেন মৃতের কোন্ কোন্ অংশ মৃত্তিকা গ্রাস করেছে। মানবদেহের কিছু অস্থি আল্লাহ্ তা'আলা এমন তৈরী করেছেন যে, এগুলোকে মৃত্তিকা গ্রাস করতে পারে না। অবশিষ্ট যেসব অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে যায়, সেগুলো সবই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে থাকে। তিনি যখন ইচ্ছা করবেন, সবগুলোকে এক জায়গায় একত্র করবেন। সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, এখন প্রত্যেক মানুষের দেহ যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত, তাতেও সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের উপাদান সন্নিবেশিত রয়েছে; কোনটি খাদ্যের আকারে এবং কোনটি ঔষধের আকারে সন্নিবেশিত হয়ে বর্তমান মানবদেহ গঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় পুনর্বার এসব উপাদানকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার পর আবার এক জায়গায় একত্র করা আল্লাহ্‌র পক্ষে কঠিন হবে কি? মৃত্যুর পর এবং মৃত্তিকায় পরিণত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা মানবদেহের এসব উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন, শুধু তাই নয়, বরং মানব সৃষ্টির পূর্বেই তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি পরিবর্তন এবং মৃত্যু পরবর্তী প্রতিটি অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে 'লওহে-মাহফূযে' লিখিত আকারে বিদ্যমান আছে।

অতএব, এমন সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সম্পর্কে উপরোক্ত বিস্ময় প্রকাশ করা স্বয়ং বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ আয়াতের এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র) ও অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।—(বাহরে-মুহীত)

فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ—অভিধানে مَرِيجٍ শব্দের অর্থ মিশ্র, যাতে বিভিন্ন প্রকার

বস্তুর মিশ্রণ থাকে এবং যার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। এরূপ বস্তু সাধারণত ফাসিদ ও দূষিত হয়ে থাকে। এ কারণেই হযরত আবূ হুরায়রা (রা) مَرِيجٍ শব্দের অনুবাদ করেছেন ফাসিদ ও দুষ্ট। যাহ্হাক, কাতাদাহ, হাসান বসরী (র) প্রমুখ এর অনুবাদ করেছেন মিশ্র ও জটিল। উদ্দেশ্য এই যে, কাফিররা নবুয়ত অস্বীকার করার ব্যাপারেও এক কথার উপর অটল থাকে না। রসূলকে কখনও যাদুকর, কখনও কবি, কখনও অতিন্দ্রিয়বাদী এবং কখনও জ্যোতিষী বলে। তাদের কথাবার্তা স্বয়ং মিশ্র ও দুষ্ট। অতএব, কোন্ কথার জওয়াব দেওয়া যায়।

এরপর নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বিশালকায় বস্তুসমূহ সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বময় শক্তি বিধৃত করা হয়েছে। নভোমণ্ডল সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ — فُرُوج শব্দটি فَرْج-এর বহুবচন। এর অর্থ ফাটল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশের এই বিশালকায় গোলক সৃষ্টি করেছেন। এটি মানুষের হাতে নির্মিত হলে এতে হাজারো জোড়াতালি ও ফাটলের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হত। কিন্তু তোমরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, এতে না কোন তালি আছে এবং না কোথাও ভগ্নাংশ বা সেলাইয়ের চিহ্ন আছে। আকাশগাত্রে নির্মিত দরজা এর পরিপন্থী নয়। কারণ, দরজাকে ফাটল বলা হয় না।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ — পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের রিসালত ও পরকাল প্রত্যাখ্যানের বিষয় বর্ণিত হয়েছিল। এটা যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য মর্মপীড়ার কারণ ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সান্ত্বনার জন্য অতীত যুগের পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন ঃ প্রত্যেক পয়গম্বরের সাথেই কাফিররা পীড়াদায়ক আচরণ করেছে। এটা পয়গম্বরগণের চিরন্তন প্রাপ্য। এতে আপনি মনক্ষুণ্ণ হবেন না। নূহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়ের কাহিনী কোরআনে বারবার বর্ণিত হয়েছে। তিনি সাড়ে নয় শ বছর পর্যন্ত তাদের হিদায়তের জন্য প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু তারা শুধু তাঁকে প্রত্যাখ্যানই করেনি ; বরং নানাভাবে উৎপীড়নও করেছে।

أَصْحَابُ الرَّسِّ কারা? ঃ رس শব্দটি আরবী ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থে ইট, পাথর ইত্যাদি দ্বারা পাকা করা হয় না এরূপ কাঁচা কূপকে رس বলা হয়। أَصْحَابُ الرَّسِّ বলে আযাবের পর সামূদ গোত্রের অবশিষ্ট লোকদেরকে বোঝানো হয়। যাহ্হাক (র) প্রমুখ তফসীরকারের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের কাহিনী এই যে, সালেহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর যখন আযাব নাযিল হয়, তখন তাদের মধ্য থেকে চার হাজার ঈমানদার ব্যক্তি এই আযাব থেকে নিরাপদ থাকে। আযাবের পর তারা এই স্থান

ত্যাগ করে হাযরামাউতে বসতি স্থাপন করে। হযরত সালেহ্ (আ)-ও তাদের সাথে ছিলেন। তারা একটি কূপের আশেপাশে বসবাস করতে থাকে। অতঃপর হযরত সালেহ্ (আ) মৃত্যু-মুখে পতিত হন। এ কারণেই এই স্থানের নাম حضر موت (হাযারা-মাউত অর্থাৎ মৃত্যু হাযির হল) হয়ে যায়। তারা এখানেই থেকে যায় এবং পরবর্তীকালে তাদের বংশধরদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন হয়। তাদের হিদায়তের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেন। তারা তাঁকে হত্যা করে। ফলে আযাবে পতিত হয় এবং তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন কূপটি অকেজো হয়ে যায় ও দালান-কোঠা শ্মশানে পরিণত হয়। কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে একথাই উল্লিখিত হয়েছে ঃ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ অর্থাৎ তাদের অকেজো কুয়া এবং মজবুত জনশূন্য দালান-কোঠা শিক্ষা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট।

ثمود — হযরত সালেহ (আ)-এর উম্মত। তাদের কাহিনী কোরআনে বারবার উল্লিখিত হয়েছে।

عاد — বিশাল বপু এবং শক্তি ও বীরত্বে আদ জাতি প্রবাদ বাক্যের ন্যায় খ্যাত ছিল। হযরত হূদ (আ) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। তারা নাফরমানী করে এবং তাঁর উপর নির্যাতন চালায়। অবশেষে ঝন্‌ঝার আযাবে সব ফানা হয়ে যায়।

اخوان لوط — হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়। তাদের কাহিনী পূর্বে কয়েকবার বর্ণিত হয়েছে।

اصحاب الايكة — ঘন জঙ্গল ও বনকে ايكة বলা হয়। তারা এরূপ জায়-গাতেই বসবাস করত। হযরত শোয়ায়েব (আ) তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা অবাধ্যতা করে এবং আযাবে পতিত হয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে যায়।

قوم تبع — ইয়ামনের জনৈক সম্রাটের উপাধি ছিল তুব্বা। সপ্তম খণ্ডের সূরা দোখানে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿١٦﴾ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿١٨﴾ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿٢٠﴾ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا

سَآئِقٌ وَّ شَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ
غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ قَرِينُهُ هٰذَا مَا لَدَيَّ
عَتِيدٌ ﴿٢٣﴾ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ
مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ
الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ
بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾
مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾

(১৬) আমি মানব সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। (১৭) যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। (১৮) সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদাপ্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। (১৯) মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে। এ থেকেই তুমি টালবাহানা করতে। (২০) এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। এটা হবে ভয় প্রদর্শনের দিন। (২১) প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে ; তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী। (২২) তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। (২৩) তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবে ঃ আমার কাছে যে আমলনামা ছিল, তা এই। (২৪) তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ বিরুদ্ধবাদীকে, (২৫) যে বাধা দিত মঙ্গলজনক কাজে, সীমালংঘনকারী, সন্দেহ পোষণকারীকে। (২৬) যে ব্যক্তি আল্লা-হ্‌র সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করত, তাকে তোমরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। (২৭) তার সঙ্গী শয়তান বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি। বস্তুত সে নিজেই ছিল সুদূর পথভ্রান্তিতে লিপ্ত। (২৮) আল্লাহ্‌ বলবেন ঃ আমার সামনে বাকবিতণ্ডা করো না। আমি তো পূর্বেই তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেছিলাম। (২৯) আমার কাছে কথা রদবদল হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে কিয়ামতের দিন মৃতদের জীবিত হওয়ার সম্ভাব্যতা প্রমাণিত হয়েছে। অতঃপর তার বাস্তবতা বর্ণনা করা হচ্ছে। বাস্তবতা পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণশক্তির উপর নির্ভরশীল। তাই

প্রথমে এ কথাই বলা হচ্ছে ঃ) আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। (এটা শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ) তার মনে যেসব কুচিন্তা জাগরিত হয়, আমি তা- (ও) জানি। (অতএব যেসব ক্রিয়াকর্ম তার হস্ত, পদ ও জিহ্বা দ্বারা সংঘটিত হয়, তা আরও উত্তমরূপে জানি ; বরং আমি তার হাল অবস্থা এত জানি যে, যা সে নিজেও জানে না। সুতরাং জানার দিক দিয়ে) আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনীর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী। (এই ধমনী কর্তন করা হলে মানুষ মারা যায়। মানুষের সাধারণ অভ্যাসে জানোয়ারের আত্মা বের করার জন্য গ্রীবা কর্তনেরই পদ্ধতি প্রচলিত আছে ; তাই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। আয়াতে কলিজা থেকে উদ্ভূত এবং হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত —উভয় প্রকার ধমনী বোঝানো যেতে পারে। তবে হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত ধমনী বোঝানোই অধিক সঙ্গত। কেননা, এই প্রকার ধমনীতে আত্মা সতেজ ও রক্ত নিস্তেজ থাকে। কলিজা থেকে উদ্ভূত ধমনীর অবস্থা এর বিপরীত। যার মধ্যে আত্মার প্রভাব বেশী, এখানে সেই ধমনী বোঝানোই উপযুক্ত। সূরা হাক্কায় হৃৎপিণ্ডের ধমনী অর্থে وتين শব্দের ব্যবহার এর সমর্থন করে। আলোচ্য আয়াতে ورید শব্দ ব্যবহৃত হলেও এর আভিধানিক অর্থের মধ্যে উভয় প্রকার ধমনী দাখিল আছে। সুতরাং উদ্দেশ্য এই যে, আমি জানার দিক দিয়ে তার আত্মা ও মনের চাইতেও অধিক নিকটবর্তী। অর্থাৎ মানুষ নিজের হাল-অবস্থা যেমন জানে, আমি তার হাল-অবস্থা তার চাইতেও বেশী জানি। সেমতে মানুষ তার অনেক অবস্থা জানে না। যা জানে, তা-ও অনেক সময় ভুলে যায়। আল্লাহ্ তা'আলার সত্তায় এর অবকাশ নেই। যে জ্ঞান সর্বাবস্থায় হয়, তা এক অবস্থার জ্ঞানের চাইতে নিশ্চিতই বেশী হবে। সুতরাং আল্লাহ্র জ্ঞান যে মানুষের সব অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত, তা প্রমাণিত হয়ে গেল। অতঃপর একে আরও জোরদার করার জন্য বলা হয়েছে যে, মানুষের ক্রিয়াকর্ম ও অবস্থা কেবল আল্লাহ্র জ্ঞানেই সংরক্ষিত নয় ; বরং বাহ্যিক তর্কের মুখ বন্ধ করার জন্য সেইসব ক্রিয়াকর্ম ফেরেশতাদের মাধ্যমে লিখিয়েও সংরক্ষিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ) যখন দুইজন গ্রহণকারী ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে (মানুষের ক্রিয়াকর্ম) গ্রহণ করে (এবং প্রত্যেক আমল লিপিবদ্ধ করে, যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ আরও বলেন ঃ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ — মানুষের সব কাজকর্মের মধ্যে কথাবার্তা সর্বাধিক হালকা। কিন্তু এর অবস্থা এই যে) সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছেই সদাপ্রস্তুত প্রহরী আছে। (নেক কথা হলে ডান দিকের ফেরেশতা এবং অসৎ কথা হলে বাম দিকের ফেরেশতা তা লিপিবদ্ধ করে। মুখে উচ্চারিত এক একটি বাক্যই যখন সংরক্ষিত ও লিখিত আছে, তখন অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম সংরক্ষিত হবে না কেন ? পরকালীন জীবন ও ক্রিয়াকর্মের প্রতিদান ও শাস্তির ভূমিকা হচ্ছে মৃত্যু। তাই মানুষকে সতর্ক করার জন্য মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। কেননা, মৃত্যু থেকে উদাসীনতার ফলস্বরূপ কিয়ামত অস্বীকার করা হয়। ইরশাদ হচ্ছে---হুঁশিয়ার হয়ে যাও)। মৃত্যু-যন্ত্রণা নিশ্চিতই (নিকটে) এসে গেছে (অর্থাৎ প্রত্যেকের মৃত্যু নিকটবর্তী)।

এ থেকেই টালবাহানা (ও পলায়ন) করতে (মৃত্যু থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি সৎ-অসৎ সবার মধ্যে একই রূপ বিদ্যমান। কাফির ও পাপাচারী ব্যক্তির সংসারাসক্তির কারণে মৃত্যু থেকে পলায়ন আরও সুস্পষ্ট। আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের আগ্রহাতিশয্যে কোন বিশেষ বান্দার কাছে যদি মৃত্যু আনন্দদায়ক ও কাম্য হয়, তবে তা এর পরিপন্থী নয়। কেননা, এটা মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাসের উর্ধ্বে। এই ভূমিকা অর্থাৎ মৃত্যুর আলোচনার পর এখন আসল উদ্দেশ্য কিয়ামতের বাস্তবতা বর্ণিত হচ্ছে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন পুনর্বার) শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে (এতে সবাই জীবিত হয়ে যাবে)। এটা হবে শাস্তির দিন। (মানুষকে এর ভয় প্রদর্শন করা হত। অতপর কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী ও অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে) প্রত্যেক ব্যক্তি এভাবে (কিয়ামতের ময়দানে) আগমন করবে যে, তার সাথে (দু'জন ফেরেশতা) থাকবে (তাদের একজন) চালক ও (অপরজন তার ক্রিয়াকর্মের) সাক্ষী। [এক হাদীসে আছে এই চালক ও সাক্ষী সেই ফেরেশতাদ্বয়ই হবে, যারা জীবদ্দশায় মানুষের ডানে ও বামে বসে ক্রিয়া-কর্ম লিপিবদ্ধ করত। (দুররে মনসূর) যদি এই হাদীস হাদীসবিদদের শর্তানুযায়ী গ্রহণ-যোগ্য না হয়, তবে অন্য দু'জন ফেরেশতা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেমন কেউ কেউ একথা বলেন। তারা কিয়ামতের ময়দানে পৌঁছার পর তাদের মধ্যে যে কাফির হবে, তাকে বলা হবে ঃ] তুমি তো এই দিন সম্পর্কে বেখবর ছিলে (অর্থাৎ একে স্বীকার করতে না) এখন আমি তোমার সম্মুখ থেকে (অস্বীকার ও উদাসীনতার) যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। (এবং কিয়ামত চাক্ষুষ দেখিয়ে দিয়েছি)। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। (অনুভূতির পথে কোন বাধা নেই। দুনিয়াতেও যদি তুমি বাধা অপসারণ করে দিতে, তবে আজ তোমার সুদিন হত। অতঃপর) তার সঙ্গী (কর্ম লিপিবদ্ধকারী) ফেরেশতা [আমলনামা উপস্থিত করে বলবে ঃ আমার কাছে যে আমলনামা ছিল, তা এই---(দুররে মনসূর) সেমতে আমল-নামা অনুযায়ী কাফিরদের সম্পর্কে উপরোক্ত দু'জন ফেরেশতাকে আদেশ করা হবে ঃ] তোমরা এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর, যে কুফর করে, (সত্যের প্রতি) ঔদ্ধত্য পোষণ করে, সৎ কাজে বাধাদান করে এবং (দাসত্বের) সীমালংঘন করে ও (ধর্মের ব্যাপারে) সন্দেহ সৃষ্টি করে। সে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করে, তাকে তোমরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। (কাফিররা যখন জানতে পারবে যে, এখন তারা চিরস্থায়ী দুর্ভোগে পতিত হবে, তখন আত্মরক্ষার্থে তারা পথভ্রষ্টকারীদেরকে অভিযোগ করে বলবে ঃ আমাদের কোন দোষ নেই। আমাদেরকে অন্যরা পথভ্রষ্ট করেছে। যেহেতু শয়তান পথ-ভ্রষ্টকারীদের মধ্যে দাখিল ছিল, তাই বলা হয়েছে ঃ) তার সঙ্গী শয়তান বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমি তাকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করিনি (যেমন তার অভিযোগ থেকে বোঝা যায়) কিন্তু (আসল ব্যাপার এই যে) সে নিজেই (স্বেচ্ছায়) সুদূর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিল (আমিও অপহরণ করেছি, কিন্তু এতে জোর-জবর ছিল না। তাই তার পথভ্রষ্টতার প্রভাব আমার উপর পতিত হওয়া উচিত নয়)। ইরশাদ হবে ঃ আমার সামনে বাকবিতণ্ডা করো না (এটা নিষ্ফল)। আমি তো পূর্বেই তোমাদের কাছে শাস্তির খবর প্রেরণ করেছিলাম (যে, যে ব্যক্তি কুফর করবে স্বেচ্ছায় অথবা অপরের প্ররোচনায় এবং যে কুফরের আদেশ করবে স্বেচ্ছায় অথবা অপরের উস্কানিতে, তাদের সবাইকে আমি স্তরের পার্থক্যসহ জাহান্নামের শাস্তি দেব। অতএব) আমার কাছে (উপরোক্ত শাস্তির বিধান)

রদবদল হবে না (বরং তোমরা সবাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে) এবং আমি (এ ব্যাপারে) বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নই। (বরং বান্দারা নিজেরাই এমন অপকর্ম করে আজ তার শাস্তি ভোগ করছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যারা হাশর ও নশর অস্বীকার করত এবং মৃতদের জীবিত হওয়াকে অবিশ্বাস্য যুক্তি বহির্ভূত বলত, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের সন্দেহ এভাবে নিরসন করা হয়েছিল যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানকে নিজেদের জ্ঞানের মাপকাঠিতে পরিমাপ করে রেখেছ। তাই এই খটকা দেখা দিয়েছে যে, মৃতের দেহ-উপাদান মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার পর এগুলোকে কিভাবে একত্র করা সম্ভব হবে ? কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু আমার জ্ঞানের আওতায় রয়েছে। এগুলোকে যখন ইচ্ছা একত্র করে দেওয়া আমার জন্য মোটেই কঠিন নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহেও আল্লাহ্র জ্ঞানের বিস্তৃতি ও সর্বব্যাপকতা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ মানুষের বিক্ষিপ্ত দেহ-উপাদান সম্পর্কে জ্ঞানী হওয়ার চাইতে বড় বিষয় এই যে, আমি প্রত্যেক মানুষের মনের নিভৃতে জাগরিত কল্পনাসমূহকেও সর্বদা ও সর্বাবস্থায় জানি। দ্বিতীয় আয়াতে এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমি গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও মানুষের অধিক নিকটবর্তী। যে ধমনীর উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল, তাও তার এতটুকু নিকটবর্তী নয়, যতটুকু আমি নিকটবর্তী। তাই তার হাল-অবস্থা স্বয়ং তার চাইতে আমি বেশী জানি।

আল্লাহ্ গ্রীবাস্থিত ধমনীর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী—একথার তাৎপর্য ঃ

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ—অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এই আয়াতে জ্ঞানগত নৈকট্য বোঝানো হয়েছে, স্থানগত নৈকট্য উদ্দেশ্য নয়।

আরবী ভাষায় وريد শব্দের অর্থ প্রত্যেক প্রাণীর সেই সমস্ত শিরা-উপশিরা যেগুলো দিয়ে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এ জাতীয় শিরা-উপশিরাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। এক. যা কলিজা থেকে উদ্ভূত হয়ে সারা দেহে খাঁটি রক্ত পৌঁছে দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এই প্রকার শিরাকেই وريد বলা হয়। দুই. যা হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত হয়ে রক্তের সূক্ষ্ম বাষ্প সারা দেহে ছড়িয়ে দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে রক্তের এই সূক্ষ্ম বাষ্পকে রূহ্ বলা হয়। প্রথম প্রকার শিরা মোটা এবং দ্বিতীয় প্রকার শিরা চিকন হয়ে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিভাষা অনুযায়ী وريد শব্দটি কলিজা থেকে উদ্ভূত শিরার অর্থে নেওয়াই জরুরী নয়। বরং হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত ধমনীকেও আভিধানিক দিক দিয়ে وريد বলা যায়। কেননা, এতেও এক প্রকার রক্তই সঞ্চালিত হয়। এ স্থলে আয়াতের উদ্দেশ্য মানুষের হৃদয়গত অবস্থা ও চিন্তাধারা অবগত হওয়া। তাই এ অর্থই অধিক উপযুক্ত। মোটকথা, উল্লিখিত দুই অর্থের মধ্যে যে কোন অর্থই নেওয়া

হোক সর্বাবস্থায় প্রাণীর জীবন এর উপর নির্ভরশীল। এসব শিরা কেটে দিলে প্রাণীর আত্মা বের হয়ে যায়। অতএব সারকথা এই দাঁড়াল যে, যে ধমনীর উপর মানবজীবন নির্ভরশীল, আমি সে ধমনীর চাইতেও অধিক তার নিকটবর্তী অর্থাৎ তার সবকিছুই আমি জানি।

সূফী বুযুর্গগণের মতে আয়াতে কেবল জ্ঞানগত নৈকট্যই উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে বিশেষ এক ধরনের সংলগ্নতা বোঝানো হয়েছে, যার স্বরূপ ও গুণাগুণ তো কারও জানা নেই, কিন্তু এই সংলগ্নতার অস্তিত্ব অবশ্যই বিদ্যমান আছে। কোরআন পাকের একাধিক আয়াত এবং অনেক সহীহ হাদীস এ তথ্যের সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ অর্থাৎ সিজদা কর এবং আমার নৈকট্যশীল হয়ে যাও। হিজরতের ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবু বকর (রা)-কে বলেছিলেনঃ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে বলেছিলেনঃ اِنَّ مَعِىَ رَبِّى অর্থাৎ আমার পালনকর্তা আমার সঙ্গে আছেন। হাদীসে আছে, মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক নিকটবর্তী তখন হয়, যখন সে সিজদায় থাকে। হাদীসে আরও আছে, আল্লাহ্ বলেনঃ আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করে।

ইবাদতের মাধ্যমে এবং মানুষের নিজের কর্ম ফলস্বরূপ অর্জিত এই নৈকট্য বিশেষভাবে মু'মিনের জন্য নির্দিষ্ট। এরূপ মু'মিন 'আল্লাহ্‌র ওলী' বলে অভিহিত হন। এই নৈকট্য সেই নৈকট্য নয়, যা প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরের প্রাণের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার সমভাবে রয়েছে। মোটকথা, উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মানুষের এক বিশেষ প্রকার সংলগ্নতা আছে, যদিও আমরা এর স্বরূপ ও গুণাগুণ উপলব্ধি করতে সক্ষম নই। মওলানা রূমী (র) তাই বলেনঃ

اتصالے بے مثال و بے قیاس - ہست رب الناس را با جان ناس

অর্থাৎ মানবাত্মার সাথে তার পালনকর্তার এমন একটা গভীর নৈকট্য বিদ্যমান, যার কোন স্বরূপ বা তুলনা বর্ণনা করা যায় না।

এই নৈকট্য ও সংলগ্নতা চোখে দেখা যায় না; বরং ঈমানী দূরদর্শিতা দ্বারা জানা যায়। তফসীরে মাযহারীতে এই নৈকট্য ও সংলগ্নতাকেই আয়াতের মর্ম সাব্যস্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের উক্তি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখানে জ্ঞানগত সংলগ্নতা বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর এই দুই অর্থ থেকে আলাদা এক তৃতীয় তফসীর এই বর্ণনা করেছেন যে আয়াতে نَحْنُ শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার

সত্তা বোঝানো হয়নি ; বরং তাঁর ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে। ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা মানুষের সাথে সাথে থাকে। তারা মানুষের প্রাণ সম্বন্ধে এতটুকু ওয়াকিফহাল, যতটুকু খোদ মানুষ তার প্রাণ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নয়।

প্রত্যেক মানুষের সাথে দুইজন ফেরেশতা আছে ঃ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ

تَلَقِّى— শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা, নেওয়া এবং অর্জন করে নেওয়া। فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمَاتٍ অর্থাৎ নিয়ে নিলেন আদম তাঁর পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য। আলোচ্য আয়াতে مُتَلَقِّيَانِ বলে দুইজন ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা প্রত্যেক মানুষের সাথে সদা সর্বদা থাকে এবং তার ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করে। عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ অর্থাৎ তাদের একজন ডানদিকে থাকে এবং সৎ কর্ম লিপিবদ্ধ করে। অপরজন বামদিকে থাকে এবং অসৎ কর্ম লিপিবদ্ধ করে। قَعِيْدٌ শব্দটি قاعد (উপবিষ্ট) অর্থে একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। قَعِيْدٌ এর অর্থ قاعد হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, قاعد শুধু উপবিষ্ট অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু قعيد শব্দটি ব্যাপক। যে ব্যক্তি কারও সঙ্গে থাকে, তাকে قعيد বলা হয়---উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক অথবা চলাফেরারত হোক। উপরোক্ত ফেরেশতাদ্বয়ের অবস্থাও তাই। তারা সর্বদা সর্বাবস্থায় মানুষের সঙ্গে থাকে---সে উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক, চলাফেরারত হোক অথবা নিদ্রিত হোক। কেবল প্রস্রাব-পায়খানা অথবা স্ত্রী-সহবাসের প্রয়োজনে যখন সে গুপ্তাঙ্গ খোলে তখন ফেরেশতাদ্বয় সরে যায়। কিন্তু তদবস্থায়ও সে কোন গোনাহ্ করলে আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি বলে তারা তা জানতে পারে।

ইবনে কাসীর আহ্‌নাফ ইবনে কায়স (র)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে লিখেছেন ঃ এই ফেরেশতাদ্বয়ের মধ্যে ডানদিকের ফেরেশতা নেক আমল লিপিবদ্ধ করে এবং বাম-দিকের ফেরেশতারও দেখাশুনা করে। মানুষ যদি কোন গোনাহ্ করে, তবে ডানদিকের ফেরেশতা বামদিকের ফেরেশতাকে বলে ঃ এখনি এটা আমলনামায় লিপিবদ্ধ করো না। তাকে সময় দাও। যদি সে তওবা করে তবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় আমলনামায় লিপিবদ্ধ কর।---(ইবনে আবী হাতেম)

আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা ঃ হযরত হাসান বসরী (র) عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন ঃ

হে আদম সন্তানগণ! তোমাদের জন্য আমলনামা বিছানো হয়েছে এবং দুইজন সম্মানিত ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়েছে। একজন তোমার ডানদিকে, অপরজন বাম-দিকে। ডান দিকের ফেরেশতা তোমার নেক আমল লিখে এবং বামদিকের ফেরেশতা গোনাহ্ ও কুকর্ম লিপিবদ্ধ করে। এখন এই সত্য সামনে রেখে তোমার মনে যা চায়, তাই কর এবং কম আমল কর কিংবা বেশী কর। অবশেষে যখন তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তখন এই আমলনামা বন্ধ করে তোমার গ্রীবায় রেখে দেওয়া হবে। এটা কবরে তোমার সাথে যাবে এবং থাকবে। অবশেষে তুমি কিয়ামতের দিন যখন কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا - اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا -

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক মানুষের আমলনামা তার ঘাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন সে তা খোলা অবস্থায় পাবে। এখন নিজের আমলনামা নিজেই পাঠ কর। তুমি নিজেই তোমার হিসাব করার জন্য যথেষ্ট।

হযরত হাসান বসরী (র) আরও বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম, তিনি বড়ই ন্যায় ও সুবিচার করেছেন, যিনি স্বয়ং তোমাকেই তোমার ক্রিয়াকর্মের হিসাবকারী করেছেন। (ইবনে কাসীর) বলা বাহুল্য, আমলনামা কোন পার্থিব কাগজ নয় যে, এর কবরে সঙ্গে যাওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকার ব্যাপারে খট্‌কা হতে পারে। এটা এমন একটা অর্থগত বস্তু যার স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তাই এর প্রত্যেক মানুষের কণ্ঠহার হওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়।

মানুষের প্রত্যেকটি কথা লিপিবদ্ধ করা হয় ঃ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ অর্থাৎ মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই পরিদর্শক ফেরেশতা রেকর্ড করে নেয়। হযরত হাসান বসরী (র) ও কাতাদাহ বলেন ঃ এই ফেরেশতা মানুষের প্রতিটি বাক্য রেকর্ড করে। তাতে কোন গোনাহ্ অথবা সওয়াব থাকুক বা না থাকুক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ কেবল সেসব বাক্য লিখিত হয়, যেগুলো সওয়াব অথবা শাস্তিযোগ্য। ইবনে কাসীর উভয় উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ আয়াতের ব্যাপকতাদৃষ্টে প্রথমোক্ত উক্তি অগ্রগণ্য মনে হয়। এরপর তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেই আলী ইবনে আবী তালহা (রা)-র এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, যদ্দ্বারা উভয় উক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। এই রেওয়ায়েতে আছে, প্রথমে তো প্রতিটি কথাই লিপি-বদ্ধ করা হয়, তাতে কোন গোনাহ্ অথবা সওয়াব থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু সপ্তাহের

বৃহস্পতিবার দিনে ফেরেশতা লিখিত বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করে এবং যেসব উক্তি সওয়াব অথবা শাস্তিযোগ্য এবং ভাল অথবা মন্দ সেগুলো রেখে বাকীগুলো মিটিয়ে দেয়। অপর এক আয়াতে আছে ঃ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ -এর অর্থ তাই।

ইমাম আহমদ (র) হযরত বিলাল ইবনে হারিস মুযনী (রা) থেকে যে রিওয়ায়েত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

মানুষ মাঝে মাঝে কোন ভাল কথা বলে। এতে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন। কিন্তু সে মামুলি বিষয় মনে করেই কথাটি বলে এবং টেরও পায় না যে, এর সওয়াব এতই সুদূর-প্রসারী যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী সন্তুষ্টি লিখে দেন। এমনিভাবে মানুষ আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কোন বাক্য মামুলি মনে করে উচ্চারণ করে। সে ধারণাও করতে পারে না যে, এর গোনাহ্ ও শাস্তি কতদূর পরিব্যাপ্ত হবে। এই বাক্যের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী অসন্তুষ্টি লিখে দেন।---(ইবনে কাসীর)

হযরত আলকামাহ্ (র) এই হাদীস উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ এই হাদীস আমাকে অনেক কথা মুখে উচ্চারণ করা থেকে বিরত রেখেছে। ---(ইবনে কাসীর)

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ মৃত্যু-যন্ত্রণা

سَكْرَةُ الْمَوْتِ— -এর অর্থ মৃত্যু-যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর সময় মূর্ছা যাওয়া। আবূ বকর ইবনে আম্বারী (র) হযরত মসরূক (র) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর মধ্যে যখন মৃত্যুর ক্রিয়া শুরু হয়, তখন তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে কাছে ডাকলেন। পিতার অবস্থা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ থেকে এই কবিতাংশ উচ্চারিত হয়ে যায় ঃ إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر —অর্থাৎ আত্মা একদিন অস্থির হবে এবং বক্ষ সংকুচিত হয়ে যাবে। হযরত আবূ বকর (রা) শুনে বললেন ঃ তুমি বৃথাই এই কবিতা পাঠ করেছ। এর পরিবর্তে এই আয়াত পাঠ করলে না কেন? وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ —ওফাতের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে এই অবস্থা দেখা দিলে তিনি হাত ভিজিয়ে মুখমণ্ডলে মালিশ করতেন এবং বলতেন ঃ لا إله إلا الله إن للموت سكرات —অর্থাৎ কালিমা তাইয়েবা পাঠ করে বলতেন ঃ মৃত্যু-যন্ত্রণা বড় সাংঘাতিক।

بِالْحَقِّ —এখানে باء অব্যয়টি تعدية অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই

যে, মৃত্যু-যন্ত্রণা সত্য বিষয়কে নিয়ে এল। অর্থাৎ মৃত্যু-যন্ত্রণা এমন বিষয়কে সামনে উপস্থিত করেছে, যা সত্য ও প্রতিষ্ঠিত এবং যা থেকে পলায়নের অবকাশ নেই। ---(মাযহারী)

ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ—تَحِيْدُ শব্দটি حَيْد থেকে উদ্ভূত। অর্থ সরে যাওয়া, পলায়ন করা। আয়াতের অর্থ এই যে, এই মৃত্যু থেকেই তুমি পলায়ন করতে।

বাহ্যত সাধারণ মানুষকে এই সম্বোধন করা হয়েছে। মৃত্যু থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি স্বভাবগতভাবে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই জীবনকে কাম্য এবং মৃত্যুকে আপদ মনে করে এ থেকে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হয়। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে গোনাহ্ নয়। কিন্তু আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের এই স্বভাব ও প্রকৃতিগত বাসনা পুরো-পুরিভাবে কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না। একদিন না একদিন মৃত্যু আসবেই; তুমি যতই পলায়ন কর না কেন।

মানুষকে হাশরের ময়দানে উপস্থিতকারী ফেরেশতাদ্বয়ঃ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ—এই আয়াতের পূর্বে কিয়ামত কায়েম হওয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে হাশরের ময়দানে মানুষের হাযির হওয়ার একটি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। হাশরের ময়দানে প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন سَائِق থাকবে। سَائِق সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে জন্তুদের অথবা কোন দলের পেছনে থেকে তাকে কোন বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দেয়। شَهِيْد-এর অর্থ সাক্ষী। سَائِق যে ফেরেশতা হবে এ ব্যাপারে সব রেওয়ায়েতই একমত। شَهِيْد-সম্পর্কে তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কারও কারও মতে সেও একজন ফেরেশতাই হবে। এভাবে প্রত্যেকের সাথে দুইজন ফেরেশতা থাকবে। একজন তাকে হাশরের ময়দানে পৌঁছাবে এবং অপরজন তার কর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। এই ফেরেশতাদ্বয় ডান ও বামে বসে আমল লিপিবদ্ধকারী কিরামুন-কাতেবীন ফেরেশতাও হতে পারে এবং অন্য দুই ফেরেশতাও হতে পারে।

شَهِيْد সম্পর্কে কেউ বলেনঃ সে হবে মানুষের আমল এবং কেউ খোদ মানুষ-কেই شَهِيْد বলেছেন। ইবনে কাসীর বলেনঃ ফেরেশতা হওয়াই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে বোঝা যায়। হযরত ওসমান গনী (রা) খোতবায় এই আয়াত তিলাওয়াত করে এই তফসীরই করেছেন। হযরত মুজাহিদ, কাতাদাহ্ ও ইবনে যায়েদ (রা) থেকেও তাই বর্ণিত আছে।

মৃত্যুর পর মানুষ এমন সবকিছু দেখবে, যা জীবিতাবস্থায় দেখতে পেত নাঃ

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ—অর্থাৎ আমি তোমাদের

সামনে থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমাদের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। এখানে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে, এ সম্পর্কেও তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। ইবনে জরীর (র), ইবনে কাসীর প্রমুখের মতে মু'মিন, কাফির, মুত্তাকী ও ফাসিক নির্বিশেষে সবাইকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া স্বপ্নজগত সদৃশ এবং পরকাল জাগরণ সদৃশ। স্বপ্নে যেমন মানুষের চক্ষুদ্বয় বন্ধ থাকে এবং কিছুই দেখে না, এমনিভাবে পরজগত সম্পর্কিত বিষয়াবলী দুনিয়াতে চর্মচক্ষে দেখে না। কিন্তু এই চর্মচক্ষু বন্ধ হওয়া মাত্রই স্বপ্নজগত খতম হয়ে জাগরণের জগত শুরু হয়ে যায়। এ জগতে পরকাল সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সামনে এসে যায়। এ কারণেই কোন কোন আলিম বলেন : الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا—অর্থাৎ আজিকার পার্থিব জীবনে সব মানুষ নিদ্রিত। যখন তারা মরে যাবে, তখন জাগ্রত হবে।

قَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ—এখানে সঙ্গী অর্থ সেই ফেরেশতা যে ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য মানুষের সাথে থাকত। পূর্বেই জানা গেছে যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা দুইজন। কিন্তু কিয়ামতে উপস্থিত হওয়ার সময় একজনকে চালক ও অপরজনকে সাক্ষী এর আগের আয়াতে বলা হয়েছে। তাই পূর্বাপর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদ্বয়কে হাশরের ময়দানে উপস্থিতির সময় দুইটি কাজ সোপর্দ করা হয়েছে। একজনকে পশ্চাতে থেকে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে হাশরের ময়দানে পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আয়াতে তাকেই سائق তথা চালক বলা হয়েছে। অপরজনের দায়িত্বে তার আমলনামা দেওয়া হয়েছে। তাকে شهيد তথা সাক্ষী নামে ব্যক্ত করা হয়েছে। হাশরের ময়দানে পৌঁছার পর আমলনামার ফেরেশতা আরম্ভ করবে : هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ অর্থাৎ তাঁর লিখিত আমলনামা আমার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। ইবনে জরীর বলেন : এখানে قرين শব্দটি দ্বারা উভয় ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে।

القيا—اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ শব্দটি দ্বিবাচক পদ। আয়াতে কোন্ ফেরেশতাদ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে? বাহ্যত পূর্বোক্ত চালক ও সাক্ষী ফেরেশতাদ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ অন্য কথাও বলেছেন। (ইবনে-কাসীর)

قرين—قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهٗ শব্দের আসল অর্থ যে সঙ্গে থাকে এবং মিলিত। এই অর্থের দিক দিয়ে আগের আয়াতে এর দ্বারা আসল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা বোঝানো হয়েছিল। উপরোক্ত ফেরেশতাদ্বয়কে যেমন মানুষের সঙ্গী হয়ে

থাকে এবং মানুষকে পথভ্রষ্টতা ও পাপের দিকে আহবান করে। আলোচ্য আয়াতে قرين বলে এই শয়তানই বোঝানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ হয়ে যাবে; তখন এই শয়তান বলবেঃ পরওয়ারদিগার, আমি তাকে পথভ্রষ্ট করিনি; বরং সে নিজেই পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করত এবং সদুপদেশে কর্ণপাত করত না। বাহ্যত বোঝা যায় যে, এর আগে জাহান্নামী ব্যক্তি নিজেই এই অজুহাত পেশ করবে যে, আমাকে এই শয়তান বিভ্রান্ত করেছিল। নতুবা আমি সৎ কাজ করতাম। এর জওয়াবে শয়তান পূর্বোক্ত কথা বলবে। উভয়ের বাকবিতণ্ডার জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ

لا تختصموا لدى وقد قدمت اليكم بالوعيد —অর্থাৎ আমার সামনে বাকবিতণ্ডা করো না। আমি তো পূর্বেই পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তোমাদের অসার ওযরের জওয়াব দিয়েছি এবং ঐশী গ্রন্থের মাধ্যমে প্রমাণাদি সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। আজ এই অনর্থক তর্ক-বিতর্ক কোন উপকারে আসবে না।

ما يبدل القول لدى وما انا بظلام للعبيد —আমার কথা রদবদল হয় না। যা ফয়সালা করেছি, তা কার্যকর হবেই। আমি কারও প্রতি জুলুম করিনি। ইন-সাফের ফয়সালা করেছি।

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾

---

(৩০) যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ?' সে বলবে, 'আরও আছে কি?' (৩১) জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে আল্লাহ্‌ভীরুদের অদূরে। (৩২) তোমাদের প্রত্যেক অনুরাগী ও স্মরণকারীকে এরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল— (৩৩) যে না দেখে দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে উপস্থিত হত—(৩৪) তোমরা এতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটাই অনন্তকাল বসবাসের দিন। (৩৫) তারা তথায় যা চাবে, তা-ই পাবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এখান থেকে হাশরের অবশিষ্ট ঘটনাবলী বর্ণিত হচ্ছে। মানুষকে সেদিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিন) সেদিন আমি জাহান্নামকে (কাফিরদের প্রবেশ করার পর) জিজ্ঞাসা করব ঃ তুমি ভরে গেছ কি? সে বলবে ঃ আরও আছে কি? [কাফিরদেরকে আরও ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেই সম্ভবত এই জিজ্ঞাসা, যাতে জওয়াব শুনে তাদের অন্তরে দোযখের আতংক আরও বেড়ে যায় যে, আমরা কিরূপ ভয়ংকর ঠিকানায় পৌঁছে গেছি। সে তো সবাইকে গ্রাস করতে চায়। জাহান্নামের তরফ থেকে 'আরও আছে কি' বলে যে জওয়াব দেওয়া হয়েছে, এটাও সম্ভবত আল্লাহ্‌র দুশমন কাফিরদের প্রতি জাহান্নামের প্রচণ্ড ক্রোধেরই বহিঃপ্রকাশ। সূরা মুলকে এই ক্রোধ এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ জাহান্নাম জওয়াবে একথা বলেনি যে, তার পেট ভরেনি। সে ক্রোধবশতই আরও চেয়েছে। কাজেই এটা لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ আয়াতের পরিপন্থী নয়। অর্থাৎ আমি জিন ও মানব দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করে দেব। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণ করে দেওয়ার সাবেক ওয়াদা অনুযায়ী জিন ও মানবকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে থাকবেন আর জাহান্নাম এ কথাই বলতে থাকবে যে, আরও আছে কি? (ইবনে কাসীর) জান্নাতের বর্ণনা এই যে] জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে আল্লাহ্‌ভীরুদের অদূরে (এবং আল্লাহ্‌ভীরুদেরকে বলা হবে ঃ) এরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তোমাদের প্রত্যেক (আল্লাহ্‌র প্রতি আন্তরিক) অনুরাগীকে (এবং সৎ কর্ম ও ইবাদত পালনকারীকে) যে না দেখে আল্লাহ্‌কে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে (আল্লাহ্‌র কাছে) উপস্থিত হত। (তাদেরকে আদেশ করা হবে ঃ) তোমরা এই জান্নাতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটা অনন্তকাল বসবাসের (আদেশ হওয়ার) দিন। তারা তথায় যা চাবে, তা-ই পাবে এবং আমার কাছে (তাদের প্রার্থিত বস্তু অপেক্ষা) আরও বেশী (নিয়ামত) আছে (যা জান্নাতীরা কল্পনাও করতে পারবে না)। জান্নাতের নিয়ামত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ জান্নাতের নিয়ামত কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তন্মধ্যে একটি নিয়ামত হচ্ছে আল্লাহ্‌র দীদার।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَوَّابٌ কারা ঃ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ—অর্থাৎ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক أَوَّابٍ ও حَفِيظٍ-এর জন্য রয়েছে। أَوَّابٍ-এর অর্থ অনুরাগী। অর্থাৎ যে ব্যক্তি গোনাহ্ থেকে সরে গিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরক্ত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ, শা'বী ও মুজাহিদ বলেন ঃ যে ব্যক্তি নির্জনতায় গোনাহ্ স্মরণ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, সেই اواب। হযরত ওবায়দ ইবনে ওমর বলেন ঃ اواب এমন ব্যক্তি, যে প্রত্যেক উঠাবসায় আল্লাহ্র কাছে গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি আরও বলেন ঃ আমাকে বলা হয়েছে যে, اواب ও حفيظ এমন ব্যক্তি, যে প্রত্যেক মজলিস থেকে উঠার সময় এই দোয়া পাঠ করে ঃ

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا اَصَبْتُ مِنْ مَجْلِسِىْ هٰذَا

আল্লাহ্ পবিত্র এবং তাঁরই প্রশংসা। হে আল্লাহ্, আমি এই মজলিসে যে গোনাহ্ করেছি, তা থেকে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠার সময় এই দোয়া পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার এই মজলিসে কৃত সব গোনাহ্ মাফ করে দেন। দোয়া এই ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্, তুমি পবিত্র এবং প্রশংসা তোমারই। তোমা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ حفيظ এমন ব্যক্তি, যে নিজ গোনাহ্সমূহ স্মরণ রাখে, যাতে সেগুলো মোচন করিয়ে নেয়। তাঁর কাছ থেকে অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে حفيظ এমন ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান স্মরণ রাখে। হযরত আবূ হুরায়রার হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে (ইশরাকের) চার রাক'আত নামায পড়ে, সে حفيظ ও اواب। ---(কুরতুবী)

وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ—আবূ বকর ওয়াররাক বলেন ঃ منيب (বিনীত) এর আলামত এই যে, সে আল্লাহ্র আদবকে সর্বদা চিন্তায় উপস্থিত রাখবে, তাঁর সামনে বিনীত ও নম্র হয়ে থাকবে এবং মনের কুবাসনা পরিত্যাগ করবে।

لَهُمْ مَّا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا—অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে যা চাবে, তা-ই পাবে। অর্থাৎ চাওয়া মাত্রই তা সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। বিলম্ব ও অপেক্ষার বিড়ম্বনা সইতে হবে না। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরীর বাচনিক রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ জান্নাতে কারও সন্তানের বাসনা হলে গর্ভধারণ, প্রসব ও সন্তানের কায়িক বৃদ্ধি---এগুলো সব এক মুহূর্তের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়ে যাবে।---(ইবনে কাসীর)

وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ—অর্থাৎ আমার কাছে এমন নিয়ামতও আছে, যার কল্পনাও মানুষ করতে পারে না। ফলে তারা এগুলোর আকাঙ্ক্ষাও করতে পারবে না। হযরত আনাস ও জাবের (রা) বলেন ঃ এই বাড়তি নিয়ামত হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার যিয়ারত তথা সাক্ষাৎ, যা জান্নাতীরা লাভ করবে। لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ আয়াতের তফসীরে এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রিওয়া-য়েতে আছে, জান্নাতীরা প্রতি শুক্রবার আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করবে।---(কুরতুবী)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ۝ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ۝

(৩৬) আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যারা তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং দেশে-বিদেশে বিচরণ করে ফিরত। তাদের কোন পলায়ন-স্থান ছিল না। (৩৭) এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে। (৩৮) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। (৩৯) অতএব তারা যা কিছু বলে, তজ্জন্য আপনি সবর করুন এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন, (৪০) রাত্রির কিছু অংশে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং নামাযের পশ্চাতেও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি তাদের (মক্কাবাসীদের) পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে (কুফরের কারণে) ধ্বংস করেছি, যারা ছিল তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল এবং (সাংসারিক সাজ-সরঞ্জাম বাড়ানোর জন্য) দেশে-বিদেশে বিচরণ করে ফিরত (অর্থাৎ শক্তিশালী হওয়ার পর জীবনোপকরণের

ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নত ছিল ; কিন্তু যখন আযাব আসল, তখন) তাদের পলায়নের স্থানও ছিল না। এতে (অর্থাৎ ধ্বংস করার ঘটনায়) তার জন্য উপদেশ রয়েছে, যে (সমঝদার) অন্তঃকরণশীল অথবা (সমঝদার না হলে কমপক্ষে) যে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে। (শ্রবণ করার পর সংক্ষেপে সত্যে বিশ্বাসী হয়ে যায়। যদি আল্লাহ্‌র কুদরতকে অক্ষম মনে করে তোমরা কিয়ামত অস্বীকার করে থাক, তবে তা বাতিল। কারণ, আমার কুদরত এমন যে,) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে (অর্থাৎ দিনের সমান সময়কালের মধ্যে) সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শও করেনি। (এমতা-

বস্থায় মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন ? আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْىِۦَ الْمَوْتٰى

এসব সন্দেহ নিরসনকারী জওয়াব সত্ত্বেও তারা অনবরত অস্বীকারই করে যাচ্ছে) অতএব আপনি সবর করুন (অর্থাৎ দুঃখ করবেন না। যেহেতু কোনদিকে মনকে নিবিষ্ট করা ব্যতীত দুঃখের কথা বিস্মৃত হওয়া যায় না। তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ) এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে (অর্থাৎ সকালের নামাযে) এবং সূর্যাস্তের পূর্বে (অর্থাৎ যোহর ও আসরের নামাযে) আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং রাত্রিতেও তাঁর পবিত্রতা (ও প্রশংসা) ঘোষণা করুন (এতে মাগরিব ও ইশা দাখিল হয়ে গেছে) এবং (ফরয) নামাযের পশ্চাতেও (এতে নফল ও ওজিফা দাখিল হয়ে গেছে। মোটকথা এই যে, আল্লাহ্‌র যিকির ও ফিকিরে মশগুল থাকুন, যাতে তাদের কুফরী কথা-বার্তার দিকে ধ্যানই না হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ — نَقَّبُوْا শব্দটি تَنْقِيْب থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ ছিদ্র করা, বিদীর্ণ করা। বাকপদ্ধতিতে দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

مَحِيْص -এর অর্থ আশ্রয়স্থল। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা তোমাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল এবং যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত। কিন্তু দেখ পরিণামে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। কোন ভূখণ্ড অথবা গৃহ তাদেরকে ধ্বংসের কবল থেকে আশ্রয় দিতে পারল না।

জ্ঞানার্জনের দুই পন্থা ঃ لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ — হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ এখানে 'কলব' বলে বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। বোধশক্তির কেন্দ্রস্থল হচ্ছে কলব

তথা অন্তকরণ। তাই একে কল্‌ব বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে কল্‌ব বলে হায়াত তথা জীবন বোঝানো হয়েছে। কারণ, কল্‌বের উপরই হায়াত ভিত্তি-শীল। আয়াতের অর্থ এই যে, এই সূরায় বর্ণিত বিষয়বস্তু দ্বারা সেই ব্যক্তিই উপদেশ ও শিক্ষার উপকার লাভ করতে পারে, যার বোধশক্তি অথবা হায়াত আছে। বোধশক্তিহীন অথবা মৃত ব্যক্তি এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে না।

أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ — لقاء سمع -এর অর্থ কোন কথা কান লাগিয়ে শোনা এবং شهيد এর অর্থ উপস্থিত। উদ্দেশ্য এই যে, দুই ব্যক্তি উল্লিখিত আয়াত-সমূহের দ্বারা উপকার লাভ করে। এক যে স্বীয় বোধশক্তি দ্বারা সব বিষয়বস্তুকে সত্য মনে করে। দুই. অথবা সে আয়াতসমূহকে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে; অন্তরকে অনুপস্থিত রেখে শুধু কানে শুনে না। তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ কামিল বুযুর্গগণ প্রথমোক্ত প্রকারের মধ্যে এবং তাঁদের অনুসারী ও মুরীদগণ দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে দাখিল।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ — سبح শব্দটি تسبيح থেকে উদ্ভূত। অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার তসবীহ্ (পবিত্রতা বর্ণনা) করা। মুখে হোক কিংবা নামাযের মাধ্যমে হোক। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন ঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে তসবীহ্ করার অর্থ ফজরের নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তসবীহ্ করার মানে আসরের নামায। হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ্‌র বাচনিক এক দীর্ঘ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

ان استطعتم ان لا تغلبوا على صلوة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها يعنى العصر والفجر ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب -

চেষ্টা কর, যাতে তোমার সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামাযগুলো ফওত না হয়ে যায়, অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায। এর প্রমাণ হিসাবে জরীর উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।---(কুরতুবী)

সেইসব তসবীহও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো সকাল-বিকাল পাঠ করার প্রতি সহীহ্ হাদীসসমূহে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে একশ বার করে 'সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করে, তার গোনাহ্ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের তরঙ্গ অপেক্ষাও বেশী হয়।---(মাযহারী)

وَأَدْبَارَ السُّجُودِ — হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ سجود বলে ফরয নামায বোঝানো হয়েছে এবং পশ্চাতে বলে সেসব তসবীহ্ বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর ফযিলত

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩৩ বার সোবহানাল্লাহ্, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ্, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং এক বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ-দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' পাঠ করবে, তার গোনাহ্ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ঢেউয়ের সমান হয়।--(বুখারী-মুসলিম) ফরয নামাযের পরে যেসব সুন্নত নামায পড়ার কথা সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, أَدْبَارَ السُّجُوْدِ বলে সেগুলোও বোঝানো যেতে পারে।—(মাযহারী)

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٤١﴾ يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿٤٢﴾ اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ؕ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٤﴾ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۫ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿٤٥﴾

(৪১) শুন, যে দিন এক আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে, (৪২) যেদিন মানুষ নিশ্চিত মহানাদ শুনতে পাবে, সেদিনই পুনরুত্থান দিবস। (৪৩) আমি জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন। (৪৪) যেদিন ভূমণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে মানুষ ছুটাছুটি করে বের হয়ে আসবে। এটা এমন সমবেত করা, যা আমার জন্য অতি সহজ। (৪৫) তারা যা বলে, তা আমি সম্যক অবগত আছি। আপনি তাদের উপর জোরজবরকারী নন। অতএব যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি, মনোযোগ সহকারে) শুন, যেদিন এক আহ্বানকারী ফেরেশতা (অর্থাৎ হযরত ইসরাফীল শিংগায় ফুঁক দিয়ে মৃতদেরকে কবর থেকে বের হয়ে আসার জন্য) নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে (অর্থাৎ আওয়াজটি নির্বিঘ্নে সবার কানে পৌঁছবে, যেন নিকটতম স্থান থেকেই কেউ আহ্বান করছে।---দূরের আওয়াজ সাধারণত কারও কানে পৌঁছে এবং কারও কানে পৌঁছে না---এরূপ হবে না)। যেদিন মানুষ এই চিৎকার নিশ্চিতরূপে শুনতে পাবে, সেদিনই (কবর থেকে) পুনরুত্থান দিবস। আমিই (এখনও) জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন

(এতেও মৃতদেরকে পুনর্জীবন দান করার শক্তির প্রতি ইঙ্গিত আছে)। যেদিন ভূমণ্ডল তাদের (অর্থাৎ মৃতদের) থেকে উন্মুক্ত হয়ে যাবে তারা (বের হয়ে কিয়ামতের দিকে) ছুটাছুটি করবে। এটা এমন সমবেত করা, যা আমার জন্য অতি সহজ। (মোটকথা, কিয়ামতের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা বার বার প্রমাণিত হয়ে গেছে। এরপরও কেউ না মানলে আপনি দুঃখ করবেন না। কেননা) তারা (কিয়ামত ইত্যাদি সম্পর্কে) যা বলে, তা আমি সম্যক অবগত আছি। (আমি নিজেই বুঝে নেব)। আপনি তাদের উপর (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) জোরজবরকারী নন; (বরং শুধু সতর্ককারী ও প্রচারকারী) অতএব কোর-আনের মাধ্যমে (সাধারণভাবে সবাইকে এবং বিশেষভাবে এমন ব্যক্তিকে) উপদেশ দান করুন, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে। [এতে ইঙ্গিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যদিও সবাইকে উপদেশ দেন এবং সবার কাছে প্রচার করেন, তবুও গুটিকতক লোকই আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করে। অতএব বোঝা গেল যে, এটা তাঁর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। অতএব ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় বিধায় এর জন্য চিন্তা কিসের?]

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ—অর্থাৎ যেদিন আহ্‌বানকারী ফেরেশতা নিকট থেকেই আহ্‌বান করবে। ইবনে আসাকির জায়দ ইবনে জাবের থেকে বর্ণনা করেন, এই ফেরেশতা আর কেউ নয়--স্বয়ং ইসরাফীল। তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরায় দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বের মৃতদেরকে এই বলে সম্বোধন করবেনঃ হে পচাগলা চামড়াসমূহ, চূর্ণ-বিচূর্ণ অস্থিসমূহ এবং বিক্ষিপ্ত কেশসমূহ! শুন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে হিসাবের জন্য সমবেত হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন।---(মাযহারী)

আয়াতে কিয়ামতের দ্বিতীয় ফুঁৎকার বর্ণিত হয়েছে, যদ্দ্বারা বিশ্বজগতকে পুনরু--জ্জীবিত করা হবে। নিকটবর্তী স্থানের অর্থ এই যে, তখন এই আওয়াযটি নিকটের ও দূরের সবাই এমনভাবে শুনবে, যেন কানের কাছ থেকেই বলা হচ্ছে। হযরত ইকরিমা বলেনঃ আওয়াযটি এমনভাবে শোনা যাবে, যেন কেউ আমাদের কানেই বলে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলেনঃ নিকটবর্তী স্থানের অর্থ বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরা। এটাই পৃথিবীর মধ্যস্থল। চতুর্দিক থেকে এর দূরত্ব সমান।---(কুরতুবী)

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا—অর্থাৎ যখন পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে সব মৃত বের হয়ে আসবে এবং ছুটাছুটি করবে। হাদীস থেকে জানা যায়, সবাই শাম দেশের দিকে দৌড়াতে থাকবে। সেখানে বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরায় ইসরাফীল (আ) সবাইকে আহ্‌বান করবেন।

তিরমিযীতে মুয়াবিয়া ইবনে হায়দা (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) শাম দেশের দিকে ইশারা করে বললেনঃ

من ههنا الى ههنا تحشرون ركبانا ومشاة وتجرون على وجوهكم يوم القيامة -

এখান থেকে সেখান পর্যন্ত তোমরা উত্থিত হবে। কেউ সওয়ার হয়ে, কেউ পদব্রজে এবং কেউ উপুড় হয়ে কিয়ামতের ময়দানে নীত হবে।

فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ — অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে আপনি কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দিন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রচারকার্য ব্যাপক হলেও একমাত্র তারাই এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে, যারা আমার শাস্তিকে ভয় করে।

হযরত কাতাদাহ্ (র) এই আয়াত পাঠ করে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَّخَافُ وَعِيْدَكَ وَيَرْجُوْا مَوْعُوْدَكَ يَا بَارُّ يَا رَحِيْمُ

হে আল্লাহ্, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আপনার শাস্তিকে ভয় করে এবং আপনার ওয়াদার আশা করে। হে ওয়াদা পূরণকারী, হে দয়াময়।